

ইসকনের বর্বরতা, ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ, অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

তানযীল আহমাদ

সাধারণ সম্পাদক, জমদ্বীপ গুজরাণে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

এক. গত ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে বিগত পনেরো বছরের ফ্যাসিস্ট, উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের সেবাদাস আওয়ামী রেজিমের পতন হয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট এবং তার প্রভু ভারত নিত্য-নতুন অপকৌশল করে দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। ইসকন নামে একটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ভারতের মদদে দেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পাঁয়তারা করে যাচ্ছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম মেয়েদের টার্গেট করে ইসকন সন্ত্রাসীরা ভাগওয়া লাভ ট্রাপ কর্মসূচি বাস্তবায়নে মেতে উঠেছে। ভাগওয়া লাভ ট্রাপ হলো, প্রথমত, মুসলিম মেয়েদেরকে কৌশলে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা, দ্বিতীয়ত, মুসলিম সেজে তাদেরকে বিয়ে করে ভারতের পতিতালয়ে বিক্রি করা, তৃতীয়ত, মুসলিম মেয়েদেরকে ফাঁদে ফেলে ধর্মান্তরিত করা, চতুর্থত, সেসব মেয়েদের দিয়ে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের তদবির করা। মোটকথা মুসলিম পরিবারকে চারিত্রিকভাবে ধ্বংস করার নীল নকশা বাস্তবায়নে তারা আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের পালিত মোসাদের প্রশিক্ষিত স্পাইরা যেভাবে মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের টার্গেট করে তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকে শেষ করে দেয়, ঠিক তেমনি ভারতের ‘র’ এবং ইসকন তাদের পালিত সন্ত্রাসীদের দ্বারা মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। পরিতাপের বিষয় হলো অনেক মুসলিম মেয়ে এমনকি পর্দাশীল মেয়েরাও তাদের লক্ষ্যবস্তুর পরিণত হচ্ছে। আরো সহজ করে বলা যায়, ইসকন চায় বিজেপির অখণ্ড ভারতের গোপন প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে; যা তাদের বিভিন্ন বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি গাজীপুরের মাওলানা আতাউল্লাহ বিক্রমপুরীকে সরাসরি ভারত থেকে নাম পরিচয়হীন এক ব্যক্তি ফোন দিয়ে হত্যার হুমকি দিয়েছে ইসকনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। গাজীপুর টঙ্গীর একজন বয়োবৃদ্ধ ইমাম মাওলানা মুহিবুল্লাহকে অপহরণ করে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে ইসকন সন্ত্রাসীরা। এর আগেও সিলেটের এক মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুর রহমানকে তারা হত্যা করে। এই সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেককে হত্যার হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এমন এক ভীতিকর পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করতে চায় যা আমরা কেউ ভাবছিই না। বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে ইসকনের সন্ত্রাসীরা সাইফুল হক আলিফ নামক এক আইনজীবীকে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্র করে— যা গোটা জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত হয় ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামের একটি সভায় চিন্ময় কৃষ্ণ বাংলাদেশের পতাকাকে অবমাননা করে এবং দেশবিরোধী উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়। এর প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম আদালতে মামলা করেন বিএনপি নেতা ফিরোজ খান। অতঃপর গত ২৫ নভেম্বর এয়ারপোর্ট থেকে চিন্ময় দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২৬ নভেম্বর আদালতে তার জামিন আবেদন না মঞ্জুর হলে ইসকনের সন্ত্রাসীরা বর্বরতা চালায় আদালত প্রাঙ্গণে। একপর্যায়ে সাইফুল হক আলিফ নামক একজন আইনজীবীকে জবাই করে হত্যা করে তারা। প্রকাশ্য দিবালোকে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি। আরো আশঙ্কার বিষয় হলো, চিন্ময় দাসের গ্রেফতারের পরপরই পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, চিন্ময়কে জামিন দেয়া না হলে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হবে এবং সেখানের মুসলিমদের তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। তার এই বক্তব্যের পরদিনই চট্টগ্রামে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ- শুভেন্দুর উস্কানিমূলক বক্তব্যই চট্টগ্রামের ইসকনকে সাহস যুগিয়েছে। পর কথা হলো— অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে ভারত কি এভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করতে পারে? এটা কেমন পররাষ্ট্রনীতি! মূলত বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার ভারতকে এমন অধিকার দিয়ে নিজের গদি টিকিয়ে রেখেছে। দেশকে বিক্রি করে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে আওয়ামী রেজিম ফায়দা নিয়েছে। ফলে ভারত চেষ্টা করে যাচ্ছে তার একান্ত অনুগত সেবাদাসকে আবারো ফিরিয়ে আনতে। আর ভারতের ‘র’ এবং ইসকন এটা বুঝতে পারে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা চায় নারায়ণ তাকবীরের পরিবর্তে জয় শ্রীরামের শ্লোগান প্রতিষ্ঠা করতে, বাংলার মুসলিমদের পায়ে গোলামীর জিজিরে আবদ্ধ করতে, সর্বোপরি, অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করাই হলো তারাই মূল্য উদ্দেশ্য।

দুই. গত ১১ জুলাই ২০১৯ খ্রি. থেকে চট্টগ্রাম নগরীর কয়েকটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে ‘ইসকন’ নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে ‘ফুড ফর লাইফ’ কর্মসূচির আড়ালে সপ্তাহব্যাপী খাবার বিতরণ করা হয়। হিন্দু সংগঠন ‘ইসকন’ খাবার বিতরণের সময় শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ধর্মীয় মন্ত্র ‘হরে কৃষ্ণ’ উচ্চারণ করতে বলে। কোমলমতী শিক্ষার্থীরা না বুঝেই তা উচ্চারণ করে তাদের ধর্মীয় প্রসাদ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে মুসলিম জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদ মিছিল বের করে। কিন্তু কার্যতঃ এখন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

বাংলাদেশ ‘ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র’ বলে দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে। ‘ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র’ বলতে বুঝায় সেই রাষ্ট্রকে, যা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের অনুসরণ করে না, রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের বিধানকে প্রয়োগ করে না, নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে না, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে রাষ্ট্র সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে না। সকল নাগরিক ধর্মীয় ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে। কোনো ধর্মপ্রচারক অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীকে প্রলোভন দেখিয়ে, জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না। বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্ট লেখা আছে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য— (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার ওপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হবে। কিন্তু হিন্দু সংগঠন ‘ইসকন’-এর কর্মীরা কোমলমতি মুসলিম শিশুদেরকে খাবার বিতরণের নাম করে প্রসাদ খাইয়ে নিজেদের ধর্মীয় মন্ত্র ‘হরে কৃষ্ণ’ পাঠ করানোর ঘটনা কি ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়? তাদের এ সকল কর্মকাণ্ড কি সংবিধানবিরোধী নয়?

‘ইসকন’ কী?

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস (ইসকন) বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ একটি হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবৈদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজিতে ISKON-এর পূর্ণরূপ International Society For Krishna Conciousness। এর প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণারবিন্দের জন্ম কলকাতায় ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ সালে। মৃত্যু ১৪ নভেম্বর ১৯৮৭। ১৯৫৯ সালে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৬ সালে ইসকন প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকা ও ইউরোপে শিষ্য সংগ্রহ করেন। এতে তিনি সফলও হন। ইউরোপ আমেরিকার অনেক যুবক-যুবতী তার সাহচর্যে এসে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে ইসকনের সদস্যপদ লাভ করে। ইসকনের সদর দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার মায়াপুরে। ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসকনের ৫০,০০০টিরও বেশি মন্দির এবং কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪টি বিদ্যালয় ও ৯০টি ভোজনালয়ও রয়েছে। বর্তমানে পূর্ব ইউরোপ ও ভারতে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ঢাকার স্বামীবাগে ইসকনের মূল কার্যালয়। যেখানে তাদের কয়েকটি মন্দির রয়েছে। প্রতি বছর তারা ৭ দিনব্যাপী রথযাত্রা পালন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সব জায়গাতে রথযাত্রা সাধারণতঃ এক দিনের হয়ে থাকে। দুপুরে শুরু হয়ে বিকালে শেষ হয়। কিন্তু ৭ দিনের হলে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই রথযাত্রার আড়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এর যথার্থতা আমরা পাই ইসকনের প্রতিষ্ঠাতার জীবনী ঘাটলে। স্বামী প্রভুপাদ ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও লেখাপড়া করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। কলকাতায় অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি চালায় খ্রিষ্টানরা, স্বামী প্রভুপাদ পেশায় ছিলেন ফার্মাসিউটিকাল ব্যবসায়ী। ১৯৬৫ সালের দিকে তিনি স্থায়ীভাবে আমেরিকা চলে যান এবং ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্কে ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসকনের মূল কথা হলো, তারা শুধু কৃষ্ণের পূজা করবে, অন্য দেবতাদের নয়। অথচ হিন্দু ধর্ম প্রধান তিন দেবতা নির্ভর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। হিন্দু ধর্ম কখনোই কৃষ্ণ নির্ভর ধর্ম নয়। এ জন্যই মূল ধর্মের হিন্দুরা স্বামী প্রভুপাদ ও ইসকনকে বাধা দেয়। সে সময় স্বামী প্রভুপাদ ও ইসকনের পাশে এসে দাঁড়ায় জেঃ স্টিলসন জজ হারভে কব্ল, ল্যারি শিন ও টমাস হপকিন্স-এর মতো বড় বড় ইয়াহুদী খ্রিষ্টানরা। অনেকেই ইসকনকে খ্রিষ্টান মিশনারীদের একটি শাখা মনে করে থাকে। অবশ্য এর যথেষ্ট কারণও আছে। যেমন- ইসকনের মন্দিরের প্রধানরা বিয়ে করতে পারবে না। যেমনটি খ্রিষ্টানদের গির্জার ফাদাররা বিয়ে করতে পারে না। অথচ হিন্দুদের পুরোহিতরা বিয়ে-শাদী সবই করতে পারে। এদিক দিয়ে খ্রিষ্টানদের সাথে ইসকনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, ইসকন কিন্তু নিজেই মন্দির তৈরি করে না; বরং সনাতন হিন্দুদের মন্দির জবর-দখল করে সেখানে তাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম চালায়। যেমন- ২০১২ সালের ২১ অক্টোবর ইসকন কর্তৃক ঠাকুরগাঁওয়ের আউলিয়াপুর গ্রামের শ্রী শ্রী রশিক রায় জিউ মন্দির দখলের প্রতিবাদে ইসকনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ করে সনাতন ধর্মের হিন্দুরা। পুরান ঢাকার স্বামীবাগে ইসকনের যে মন্দির আছে, যেখানে আগে সনাতন হিন্দুদের মন্দির ছিল। মূল ধারার হিন্দুদের থেকে চক্রান্ত করে দখল করে ইসকন সেখানে তাদের বিশাল মন্দির নির্মাণ করেছে। ‘বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা- “বাংলাদেশের” নামক বইয়ে উল্লেখ আছে, ‘ইসকন নামে একটি সংগঠন বাংলাদেশে কাজ করেছে। এর সদর দপ্তর নদীয়া জেলার পাশে মায়াপুরে। মূলতঃ এটা ইহুদীদের একটি সংগঠন বলে জানা গেছে। এই সংগঠনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উস্কানিমূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি। (বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা- বাংলাদেশের র’- পৃ. ১৭১।)

বাংলাদেশে ইসকনের কিছু উস্কানিমূলক ও সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ড

১. ২০১২ সালে ঠাকুরগাঁওয়ে সনাতন এক হিন্দুকে হত্যা করে মন্দির দখল করে ইসকন। পঞ্চগড়েও মূল ধারার হিন্দুদেরকে পিটিয়েছে তারা। ঢাকার স্বামীবাগে সনাতন হিন্দুদের মন্দির দখল।
২. সিলেটের জগন্নাথপুরের রথযাত্রায় হামলা চালিয়েছে ইসকন নেতা মিন্টু ধর।
৩. স্বামীবাগে মসজিদের তারাবী বন্ধ করে দিয়েছিল ইসকন। নামাযের সময় গান-বাজনা বন্ধ রাখতে বলায় তারা পুলিশ ডেকে তারাবীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে বিষয়টি নিয়ে সংঘর্ষ হয়।

৪. বাংলাদেশে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠন তৈরি করে উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিস্তৃতি ঘটানো। যেমন- জাতীয় হিন্দু মহাজোট, জাগো হিন্দু বেদান্ত ইত্যাদি। বর্তমানে অনলাইনে যে ধর্ম অবমাননা করা হয় তার ৯০% করে ইসকন সদস্যরা।

৫. সাম্প্রতিক সময়ে চাকরিতে প্রচুর হিন্দু প্রবেশের অন্যতম কারণ- ইসকন হিন্দুদের চাকরিতে প্রবেশ করানোর জন্য প্রচুর ইনভেস্ট করে।

৬. সম্প্রতি চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্কুলে প্রসাদ বিতরণ করে মুসলিম শিশুদেরকে তাদের মন্ত্র ‘হরে কৃষ্ণ’ পাঠ করায়।

এখানেই নয়, তাদের আরো দাবি হলো- সংসদে হিন্দুদের ৬০টি সংরক্ষিত আসন, উপ-রাষ্ট্রপতি ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।

সুতরাং ইসকন মোটেও সাধারণ কোনো সংগঠন নয়। বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সরকারের উচিত উগ্রতা ছড়িয়ে দেয়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা, দেশের স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য এবং ফ্যাসিস্ট আওয়ামী রেজিমকে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরানোর অপতৎপরতা রোধে তাদেরকে নিষিদ্ধ করা। দেশের নিরাপত্তার জন্য এমন সিদ্ধান্ত জরুরি। কথিত ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে যদি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে ইসকনকে কেনো নিষিদ্ধ করা হবে না?

তিন. গত ২০১৯ সালের ১৬ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা ও প্রতিনিধিদের সাথে হোয়াইট হাউজে কথা বলেন। মার্কিন টিভি চ্যানেল এবিসি নেটওয়ার্কের এবিসি ফোর সেই সংবাদ ভিডিওসহ প্রচার করে। বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল ও ধর্মের প্রায় ২৭ জন প্রতিনিধি হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাথে দেখা করেন। তারা হলেন : নিউজিল্যান্ড, কিউবা, ইরিত্রিয়া, ইরান, নাইজেরিয়া, আমেরিকা, সুদান, ভিয়েতনাম, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, জিনজিয়ান, উত্তর কোরিয়া, তিব্বত, চীন, বাংলাদেশ, মায়ানমার, পাকিস্তান, জার্মানীর খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, শী‘আ, কাদিয়ানী, হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধিগণ। তারা তাদের অভিযোগ তুলে ধরেন এবং সন্ত্রাসবাদের! বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রশংসা করেন।

এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়া সাহা নামের এক মহিলা। যিনি ‘বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ’ এর সাংগঠনিক সেক্রেটারী। প্রিয়া সাহা ট্রাম্পের কাছে অভিযোগ করে বলেন, ‘আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান নিখোঁজ রয়েছেন। দয়া করে আমাদের লোকজনকে সহায়তা করুন, আমরা আমাদের দেশে থাকতে চাই।

এরপর তিনি বলেন, এখন সেখানে ১ কোটি ৮০ লাখ সংখ্যালঘু রয়েছে। আমরা আমাদের বাড়িঘর খুইয়েছি। তারা আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের ভূমি দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো বিচার পাইনি।

এ সময় ট্রাম্প প্রশ্ন করেন, কারা জমি দখল করেছে, কারা বাড়ি-ঘর দখল করেছে?

উত্তরে প্রিয়া সাহা বলেন, তারা মুসলিম মৌলবাদি গ্রুপ এবং তারা সব সময় রাজনৈতিক আশ্রয় পায়। সব সময়ই পায়।

এই বক্তব্য প্রচারিত হওয়ার পরপরই বাংলাদেশে হৈ চৈ পড়ে যায়। এমন নিরেট ও নির্জলা মিথ্যা কথা কেউ প্রকাশ্যে কখনো বলতে পারে, তা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করেনি। এমনকি আওয়ামী সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, বিশিষ্টজন ও সাধারণ জনগণ এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। এ ধরনের বক্তব্যের পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র লুকায়িত আছে বলে অনেকেই মন্তব্য করেন। এই সংবাদের পরে ‘বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ’-এর সাধারণ সম্পাদক রানা দাসগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘প্রিয়া সাহার বক্তব্য ব্যক্তিগত। এই বক্তব্যের দায়ভার সংগঠন নিবে না।’ অথচ একটি সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক আমেরিকার মতো দেশে গিয়ে হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টের সাথে সরাসরি কথা বলে- তা ব্যক্তিগত কথা হয় কিভাবে এটা আমাদের বোধগম্য নয়।

এদিকে ৭১ টিভির রিপোর্টার প্রিয়া সাহার জন্মস্থান পিরোজপুরের নাজিরপুরে স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে চ্যানেলে প্রচার করে। স্থানীয় লোকজনের বক্তব্য অনুযায়ী নাজিরপুরের হিন্দু-মুসলিম সকলেই সহাবস্থানে বসবাস করে আসছে। তাদের মাঝে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা নেই। হিন্দুদেরকে বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করা বা জ্বালিয়ে দেয়ার মতো কোনো ঘটনাই সেখানে ঘটেনি।

তারা আরো উল্লেখ করেন, মূলতঃ প্রিয়া সাহা তার ভাইয়ের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে সেটাকে সাম্প্রদায়িক হামলা বলে চালানোর চেষ্টা করে। অন্যদিকে, পিরোজপুর ও বাগেরহাটের মাঝখানে একটি দ্বীপ নিয়ে দুই পাড়ের মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষ লেগে আছে। কখনো কখনো তা মারামারিতে রূপ নেয়। এতে উভয়পক্ষের হিন্দু-মুসলিম সকলেই অংশ নেয়। ধর্মীয় কারণে নয়; বরং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের জন্য এই লড়াই চলে আসছে। প্রিয়া সাহা এটাকেই সাম্প্রদায়িক হামলা বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন বলে এলাকাবাসী উল্লেখ করে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট নামক টিভি চ্যানেলও একই রকম রিপোর্ট প্রচার করে।

প্রিয়া সাহার বক্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে আদালত মামলা নেয়নি। উল্টো সুমন সাহেবের বিরুদ্ধে প্রিয়া সাহা মানহানিকর মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠার পর প্রিয়া সাহা লাইভে আসেন। তার ঐ বক্তব্যের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি এ রকম বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দিয়েছি। তিনি বিরোধীদলীয় নেত্রী থাকাবস্থায় বিভিন্ন দেশে গিয়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতনের কথা উল্লেখ করতেন।

সম্মানিত পাঠক! প্রিয়া সাহার এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ফলাফল যা দাঁড়ায়, তা হলো—

০১. তিনি সাধারণ কেউ হলেও তার পেছনে হিন্দু সম্প্রদায় বা ভারতের অনেক বড় সহযোগিতা রয়েছে। নইলে মামুলি কেউ মি. ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে পারেন না।

০২. সরকারের প্রথম দিনের শক্ত বক্তব্য থেকে পিছু হটে দ্বিতীয় দিনে গলার সুর নরম করায় আর কারো বুঝতে বাকি নেই যে, সরকার ভারতের চাপের কাছে নতজানু হয়ে পড়েছে।

০৩. প্রিয়া সাহা বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সংখ্যালঘু নির্যাতন মূল উদ্দেশ্য নয়, বাংলাদেশে হিন্দু সংগঠনগুলোকে আরো উগ্রবাদী করে তোলা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকার নগ্ন হস্তক্ষেপ ভিক্ষা চাওয়া এবং ভারতের প্রিয়ভাজন ও ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নই মুখ্য উদ্দেশ্য।

০৪. দেশের ভাবমর্যাদা রক্ষার বদৌলতে বিশ্বের নিকটে দেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে দেশকে একটি অকার্যকর ও অস্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার হীন উদ্দেশ্যে প্রিয়া সাহা গং কাজ করে যাচ্ছে। সুযোগ পেলেই এরা বিদেশীদের নিকটে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে এ দেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিমোদ্যার করে।

ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ

২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ গত বছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় শেষের ছয় মাসে ভারতে মুসলিমবিদ্বেষ ৬২ শতাংশ বেড়েছে। বিশেষ করে বছরের শেষ তিন মাসে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের বেশির ভাগই ইসরায়েলি হামাস সংঘাত ইস্যু নিয়ে। ওয়াশিংটন-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়া হেট ল্যাবের এক প্রতিবেদনের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। ইন্ডিয়া হেট ল্যাবের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালে মুসলিমদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন মাধ্যমে ৬৬৮টি ঘৃণামূলক বক্তব্যের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৫৫টি বছরের প্রথমার্ধে ঘটেছে, আর ৪১৩টি শেষ ছয় মাসে ঘটেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুসলিমবিদ্বেষের প্রায় ৭৫ শতাংশ বা ৪৯৮টি মন্তব্যের ঘটনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলোতে ঘটেছে। মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলিমবিদ্বেষ বক্তব্য দেখা গেছে। ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদি। তার দল বিজেপির শাসনামলে মুসলিমবিদ্বেষ বেড়েছে বলে অভিযোগ করে আসছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো। মার্কিন ওই গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলছে, তারা বিদ্বেষী মন্তব্য নিয়ে জাতিসংঘ যে সংজ্ঞা দিয়েছে, সে অনুযায়ী যাচাইবাছাই করেছে। প্রতিবেদন বলছে, গাজা ইস্যুতে ৭ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে মুসলিমবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়েছে ৪১টি। বছরের শেষ তিন মাসে যেসব মুসলিমবিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে, এর মধ্যে ২০ শতাংশই এই ইস্যুতে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব আইনের দিকে ইঙ্গিত করেছে যা জাতিসংঘ মৌলিকভাবে বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত করেছে। এছাড়া সম্প্রতি ভারতে অবৈধ নির্মাণ অপসারণের নামে মুসলমানদের ধর্মীয় অবকাঠামো মসজিদ ধ্বংসের সংখ্যাও বেড়েছে। এ ছাড়া বিজেপির শাসনামলেই কর্ণাটকের ক্লাসরুমে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (দেশ রূপান্তর- ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।)

প্রিয় পাঠক! দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বাংলাদেশের মতো ভালো অবস্থানে অন্য কোনো রাষ্ট্র নেই। বিশ্ববাসী মিয়ানমারের নৃশংসতা দেখেছে। কয়েক লাখ মুসলিমকে সন্ত্রাসী বৌদ্ধরা দেশান্তর করেছে। অসংখ্য মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। মা-বোনদের ইজ্জত ভুলুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে তাদেরকে জবাই করা হয়েছে। এদিকে প্রিয়া সাহার প্রিয়ভূমি(!) ভারতে বিজেপি সরকারের মদদে চরম উগ্রবাদী আরএসএস ও অন্য সংগঠনগুলো মুসলিমদের সাথে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণে মেতে উঠেছে। সারা পৃথিবী তাবরিজ আনসারীর লোমহর্ষক মৃত্যু নীরবে অবলোকন করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৫০ জন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছে। জয় শ্রীরাম বলেও মুসলিমরা রেহাই পাচ্ছে না ভারতে। কই বাংলাদেশে তো এখন পর্যন্ত এ ঘটনা কোথাও ঘটেনি যে, কোনো হিন্দুকে মুসলিমরা জোর করে আল্লাহু আকবার বলাচ্ছেন। তাদেরকে অত্যাচার করছেন।

আমরা যদি বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের উপস্থিতি লক্ষ্য করি তাহলেই বুঝতে পারব এ দেশে হিন্দুরা কেমন বহাল তবিয়ে আছে। ‘ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ’ (টি.আই.বি)-এর একটি গবেষণায় ফুটে উঠেছে, স্বাধীনতা পরবর্তী সকল সময়ে সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুর উপস্থিতি ১০%-এর বেশি ছিল। সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদকে নিয়ে বাংলাদেশে বেশি সমালোচনা হয়, অথচ তার আমলেই সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে বেশি চাকরি পায়। টি.আই.বি’র গবেষক মোহাম্মদ রেজাউল করিম লিখেন,

“The outstanding finding in that the representation of the minority communities in the general cadre of BCS job was noticeably higher in the Ershad regime (13.22%) than that of BNP (5.05%), and awami league (6.34%) regimes. In case of professional cadres, no remarkable difference was observed.”

অর্থাৎ- বিসিএস-এর সাধারণ ক্যাডারে সংখ্যালঘুদের চাকরি এরশাদের আমলে লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, তার আমলে ১৩.২২%, বিএনপির আমলে ৫.০৫% এবং আওয়ামী লীগের আমলে ৬.৩৪% মাইনরিটি সরকারি চাকরি পায়। প্রফেশনাল ক্যাডারের চাকরির ক্ষেত্রেও কোনোরূপ পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়নি। (ডেইলি স্টার- ৩ জুলাই ২০০৭।)

উক্ত জরিপ অবশ্য ২০০৬ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে এ চিত্র ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ২০১৫ সালের অক্টোবরে ওলামা লীগ কোনো রাখটাক ছাড়াই পাবলিকলি সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘু নিয়োগের একটি চিত্র পেশ করে। তারা বলে,

৯০ ভাগ মুসলমানদের দেশে চাকরির নিয়োগ আনুপাতিক হারে হতে হবে। কিন্তু প্রশাসনে হিন্দুতোষণ হচ্ছে। গত ২০১৩ সালের অক্টোবরে পুলিশের এসআই পদে নিয়োগে ১৫২০ জনের মধ্যে হিন্দু নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৩৩৪ জন, যা মোটের ২১.৯৭ শতাংশ। ২০১১ সালে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইতে নিয়োগের ৯৩ জনের মধ্যে ২৩ জন হিন্দু নিয়োগ করা হয়েছে, যা মোটের ২৪.৭৩ শতাংশ। সম্প্রতি ষষ্ঠ ব্যাচে সহকারী জজ পদে নিয়োগ দেয়া ১২৪ জনের মধ্যে ২২ জনই হিন্দু, যা মোটের ১৭ শতাংশ। (আমাদের সময়.কম- ১৭ অক্টোবর ২০১৫।)

(উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মুসলিমরা ৯০ শতাংশ, হিন্দু ৮ শতাংশ ও খ্রিষ্টান-বৌদ্ধরা ২ শতাংশ।)

২০০৭ সালে সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি ছিল ১৯%, যা ২০১৫ সালে ২৯ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। বর্তমানে এ হিসাব আরো অনেক বেশি।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগ নেতা নূরে আলম সিদ্দীকি চ্যানেল আই টিভির এক অনুষ্ঠানে বলেন, সম্প্রতি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে যেসব কর্মকর্তার পদোন্নতি হয়েছে তাদের ৬৭ জনের মধ্যে ৪৬ জনই অমুসলিম। ৯১ ভাগ মুসলমানের দেশে এভাবে অমুসলিম কর্মকর্তার সংখ্যাধিক্য কোনোভাবেই স্বাভাবিক বিষয় নয়। আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানাতে চায়। আমরা কি অন্যের দ্বারা শাসিত হতে দেশ স্বাধীন করেছি? (মূলধারা বাংলাদেশ- ১৫ জানুয়ারি ২০১৬।)

তবে আলহামদু লিল্লাহ, গত ৫ই আগস্ট আওয়ামী রেজিমের পতনের মাধ্যমে ভারতের আধিপত্যবাদ অনেকটাই ধ্বংস হয়েছে। এখন সময় এসেছে দেশকে ভারতীয় খপ্পর থেকে সর্বদিক থেকে মুক্ত করা। এখন পর্যন্ত ভারতের দাসত্ব করে যাচ্ছে প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ কিছু মিডিয়া। তাদের ব্যাপারেও সরকারের নতজানু সিদ্ধান্ত রক্তাক্ত জুলাই বিপ্লবকে ব্যাহত করবে। সরকারের উচিত এসব ভারতীয় সেবাদাস মিডিয়াসহ ইসকনকে নিষিদ্ধ করে ছাত্র-জনতার বিপ্লবকে রক্ষা করা এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা।

তথ্যসূত্র : ০১. দৈনিক নয়া দিগন্ত। ০২. দৈনিক প্রথম আলো। ০৩. দৈনিক ইনকিলাব। ০৪. বাংলাদেশ প্রতিদিন। ০৫. যুগান্তর। ০৬. দেশ রূপান্তর। ০৭. The Daily Star। ০৮. মুসলমানের মানবাধিকার থাকতে নেই, মাহমুদুর রহমান। ০৯. উইকিপিডিয়া। ১০. বিভিন্ন প্রবন্ধ।